নামকরণ :

নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে নাট্যকারদের দ্বারা অবলম্বিত পথ হলো কয়েকটি চিরাচরিত ধারায় নামকরণের পথ,—

(i) চরিত্রের নামে নামকরণ।

(ii) বিষয়বস্তুর অনুযায়ী নামকরণ।

(iii) স্থান নাম অনুযায়ী নামকরণ।

(iv) ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ।

ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নাট্যকারেরা প্রথম দুটি পন্থার অনুসরণ করে থাকেন। কারণ ঐতিহাসিক চরিত্রের নামে নামকরণ করা হলে সমস্যা যায়—অনেকটা কমে। ঘটনা ধারা অনুসারে নামকরণের সমস্যা এখানে যে একাধিক চরিত্র সে ঘটনাস্রোতে গুরুত্ব পেয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কোন চরিত্রের পরিণতি দেখানোর অভিপ্রায়ে এ নাটকের প্রস্তাবনা তা বোঝানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির দিকে তাকালে তাই দেখা যায় চরিত্রের নামে নামকরণের প্রাধান্য। নাট্যকার সেখানে নাটকে যে চরিত্রের আবির্ভাব, তার জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তাকে স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে গিয়েছেন অনিবার্য পরিণতির দিকে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলি মূলত চরিত্র-নামকেন্দ্রিক। তাঁর 'নুরজাহান' নাটকটিও এই শ্রেণীতেই পড়ে। কেননা,—

'নুরজাহান' নাটকের একটি চরিত্র নুরজাহান—আর তার নামেই এ নাটকের নামাঙ্কনে এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নাট্যকার নাটকের নামাঙ্কনের ব্যাপারে অন্য পদ্ধতিকে ছেড়ে কেবল চরিত্র নামে নামকরণ যে অবলম্বন করেছেন। এক্ষেত্রে, বিশেষ উদ্দেশ্য, ব্যঞ্জনা, স্থান নাম—কোন কিছুতেই তেমন গুরুত্ব দেন নি।

চরিত্র নামে নামাঙ্কনে সমস্যা একটাই—গোলাপকে গোলাপ নামে না ডাকার সমস্যা। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি চরিত্রকেন্দ্রিক নামাঙ্কন যুক্ত নাটকে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে—যেমন 'তারাবাঈ', 'দুর্গাদাস', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' ইত্যাদি নাটক। সেক্সপীয়রও দ্বিজেন্দ্রলাল 'তারাবাঈ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথের আদলে সূর্যমলের পত্নী তমসা চরিত্রকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন তার কাছে তারাবাঈ চরিত্রটি বড় ম্লান দেখিয়েছে। অথচ তার নামেই এ নাটকের নামাঙ্কন করেছেন নাট্যকার। 'দুর্গাদাস' নাটকে রাঠোর বীর দুর্গাদাসের চরিত্র ঔরঙ্গজীব পত্নী গুলনেয়ার কাছে ম্লান মনে হয়েছে। সক্রিয়তার প্রশ্নে একই রকম ভাবে ঔরঙ্গজীবের কাছে 'সাজাহান' নাটকের সাজাহান চরিত্রকে, 'চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের কাছে চন্দ্রগুপ্তকে ম্লান বলে মনে হয়েছে।

কিন্তু সক্রিয়তাই যদি প্রথম শর্ত হয় তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় 'নুরজাহান' নাটকের অন্যতম সক্রিয় চরিত্র নুরজাহান। নাট্যকাহিনীর কেন্দ্রে বিরাজিত থেকে তিনি কাহিনী নিয়ন্ত্রণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে ইতিহাসের তথ্য তার সহায়কও হয়েছে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় সমস্ত নাটকেই জুড়ে রয়েছে মেহেরউন্নিসা তথা

নুরজাহান। শের খাঁর সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় দাম্পত্য প্রেমের অনবদ্য ছবি ফুটে উঠলেও এ কথা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে তিনি আর পাঁচটা সাধারণ বঙ্গকুলবধূর মতো নন। তাঁর অন্তরে নিরন্তর জেগেছে উচ্চ আশা ও নিরাশার ঢেউ।—তাই ভ্রাতা আসফ খাঁ সেলিমের সম্রাট হবার খবর দিলে নুরজাহানের মনে জেগেছে এক অস্বাভাবিক আলোড়ন,—

> "সেলিম সম্রাট। —আবার সে কথা কেন মনে আসে? না সে চিন্তাকে আমি মনে আস্‌তে দেব না। না না না। সে প্রথম যৌবনের একটা খেয়ালমাত্র। এখন আবার সে চিন্তা কেন! সেলিম সম্রাট, তাতে আমার কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?" (১/১)

নুরজাহান চেয়েছেন ঘরের কুলবধূর ভূমিকা পালন করতে। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বামীকে পাঁচ হাজারী সেনার সেনাপতির পদ দিয়ে আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে তিনি তাঁকে সেখানে যেতে নিষেধ করেছেন। সেলিমের সঙ্গে তাঁর অতীত সম্পর্কের বিষয়টি সম্ভবত তাঁকে এ সময় প্রথমবার তাড়া করা শুরু করেছে।

ঘটনাচক্রে শের খাঁ সেই জটিল রাজনৈতিক আবর্তে এবং জাহাঙ্গীরের লালসার অদৃশ্য জালে জড়িয়ে পড়লে নুরজাহান চেষ্টা করেছেন স্বামীকে সেই মৃত্যুর গ্রাস থেকে দূরে সরিয়ে এনে দাম্পত্যের স্নিগ্ধতায় নিজেদের জীবনের আনন্দের মুহূর্তকে অক্ষয় রাখতে। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। জাহাঙ্গীর প্রেরিত কুতুব খাঁর বাহিনীর হাতে শের খাঁ নিহত হয়েছেন। জাহাঙ্গীরের চক্রান্তে শের খাঁর এই জঘন্য হত্যা নুরজাহানকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। ফলে আবার এক অদ্ভুত দোটানায় তাঁর চিত্ত যেন দোলায়িত হতে থাকে। সেই দোলনের পর্যায়গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়,—

(i) নাটকের প্রথম দৃশ্যেই জানা গেছে সেলিমের সঙ্গে নুরজাহানের একটা পুরাণো টানের কথা। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!' বলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হৃদয়কে ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন নুরজাহান।

(ii) স্বামী হন্তারক জাহাঙ্গীরের প্রতি জেগে ওঠা তাঁর তীব্র ঘৃণা অস্থির করেছে তাঁকে, এ ঘৃণা দূর করার চেষ্টা করেছেন নুরজাহানের ভ্রাতা—কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁকে নানা সংবাদ দুলিয়ে দিয়ে গেলেও সে সময় পর্যন্ত তিনি জাহাঙ্গীরের থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছেন। আবার কন্যা লয়লার সঙ্গে কথোপকথনের পরও আসফ খাঁর অনুরোধে স্থির করে ফেলেন নুরজাহান জাহাঙ্গীরের ডাকে সাড়া দেবেন। তবে তাঁর উদ্দেশ্য হবে তাঁর সবংশে সর্বনাশ সাধন করা।

বরণ করে নেন নুরজাহান জাহাঙ্গীরকে। শুরু হয় তাঁর জীবনের নবপর্যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীর এখন তাঁর ক্রীড়নককে পরিণত। তিনি সুরা, সঙ্গীত আর চুম্বনমূল্যে নুরজাহানের আজ্ঞাদাসে পরিণত। ইতিহাসকে বিন্দুমাত্র বিকৃত না করে নাট্যকার এখানে নুরজাহানের অপ্রতিহত অগ্রগতির চিত্র এঁকেছেন। নুরজাহানের নিখুঁত পরিকল্পনায় হাতে বিন্দুমাত্র রক্তের দাগ না লাগিয়ে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন তাঁর সব পথের কাঁটা। সম্রাজ্ঞী রেবাকে কোণঠাসা করে জগতের আলো হয়ে ওঠা নুরজাহান তাঁর ছেলে খসরুকে হত্যা করিয়েছেন। সেই হত্যার দায় সাজাহানের উপর চাপিয়ে তাকেও সম্রাটের চরম দণ্ড দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন।

কিন্তু মহাবৎ খাঁর প্রয়াসে সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

মোঘল পরিবারের বিপর্যয় ঘটানো ছিল নুরজাহানের জীবনের মূল লক্ষ্য, সে লক্ষ্যপূরণে প্রয়াস যখন প্রায় সফল সে সময় তাঁর উন্নতির দুরন্ত ঘোড়া যেন গতিমুখ বদল করে সাজাহানের বিচারকে কেন্দ্র করে। শুরু হয় মহাবৎ খাঁর সঙ্গে তাঁর শত্রুতা। আঘাত পান তিনি আর এক জায়গায় তাঁর কন্যা লয়লা ভালোবেসে ফেলে শারিয়ারকে। লয়লা চায় মায়ের মনের হিংসার মূল উপড়ে ফেলতে, কিন্তু নুরজাহান ক্ষমতা লোভে অন্ধ। আর এই অতিরিক্ত অসম্ভব উচ্চাশা তাকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার উচ্চশিখর থেকে অমানবিকতার পঙ্কিল পথে নামিয়ে নিয়ে আসে বৃত্তিভোগী সাধারণ রমণীর আসনে।

'নুরজাহান' নাটকে তাই নুরজাহানের মতো সক্রিয় চরিত্র কে? তাঁর মতো আর সুখী চরিত্র কে? তাঁর মতো আর দুঃখী চরিত্রই বা কোনটি? চরিত্রের অন্তরের বিপুল উচ্ছ্বাস আর দোলাচলতা 'নুরজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের আসনে বসিয়েছে তাঁকেই। তাই তাঁর নামে এ নাটকের নামকরণ যথার্থ হয়েছে।